20081118_ABP_SB_000_004.pdf 18/11/2008 09:28 AM Page 1

SE

বন্দে মাতরম

আনন্দবাজার পত্রিকা

[redacted]

৮৭ বর্ষ ২৪০ সংখ্যা মঙ্গলবার ২ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ কলকাতা

নূতন বিশ্বশক্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে ছয় দশকেরও বেশি সময় উত্তীর্ণ। এই ছয় দশকে পরিবর্তনের সংখ্যা অগণন। ভারত যে চাঁদে সফল ভাবে চন্দ্রযান পাঠাইতে পারে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্নে তাহা প্রায় অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু, এই মধ্যবর্তী ছয় দশক তাহা সম্ভব করিয়াছে। তেমনই, ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রিটন উডস-এর মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে মিত্রশক্তির ৪৪টি দেশের ৭৩০জন প্রতিনিধি যখন বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অর্থনীতির পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে আলোচনায় বসিয়াছিলেন, তখন এই কথাটি অকল্পনীয় ছিল যে ভারত বা চিন এক দিন অর্থনীতির বিশ্বে মহাশক্তি হইয়া উঠিতে পারে। গত এক দশকের বাস্তব বলিতেছে, সেই কল্পনার অতীত ঘটনাই সত্য হইয়াছে। কিন্তু, ব্রিটন উডস চুক্তির ফলে যে দুইটি আর্থিক সংস্থা, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তাহার পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন দেশের গুরুত্ব এখনও সেই ১৯৪৪ সালের নিরিখে নির্ধারিত হয়। অর্থনৈতিক মহাশক্তি হইয়া উঠিলেও এখনও ভারত বা চিনের মতামতের গুরুত্ব এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিতান্তই কম। পরিস্থিতিটি বাস্তবের পরিপন্থী। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে আয়োজিত জি ২০ জোটের বৈঠকে স্থির হইল, এই রূপ গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভারত ও চিনের ন্যায় দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা হইবে। সম্ভবত ফাইনানশিয়াল স্টেবিলিটি ফোরাম-এ এই দেশগুলির অন্তর্ভুক্তি হইতেই প্রক্রিয়াটির সূচনা হইবে। এ কথা ঠিক যে বিষয়টি এখনও পর্যন্ত আলোচনার স্তরেই রহিয়াছে, কিন্তু উন্নত দেশগুলি যে ভারত বা চিনের ন্যায় দেশের অর্থনৈতিক উত্থানকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে বাধ্য হইতেছে, এই আলোচনা তাহারই প্রমাণ। অর্থনীতির বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের একাধিপত্যের দিন যে ফুরাইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত সেই পর্বান্তরেরই সূচক।

ওয়াশিংটন বৈঠকের লক্ষ্য ছিল, যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকট চলিতেছে, তাহার সমাধান করা ও ভবিষ্যতে যাহাতে এই সংকটের পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহা নিশ্চিত করা। প্রথম দফার বৈঠকে যে চূড়ান্ত সমাধানসূত্র মিলিবে না, সেই পূর্বানুমান লইয়াই বৈঠকটি আরম্ভ হইয়াছিল। তবু, বৈঠকটি নিষ্ফলা হয় নাই। বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলির নেতারা একমত হইয়াছেন, এই সংকট হইতে পরিত্রাণের প্রথম উপায়, রাজস্ব খাতে ব্যয়বৃদ্ধি করা। ১৯২৯ সালের মহামন্দার প্রেক্ষিতে জন মেনার্ড কেইনস যে তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, বর্তমান সংকটে নেতারা সেই তত্ত্বেরই শরণাপন্ন হইয়াছেন। অর্থনৈতিক মন্দার প্রধান লক্ষণ সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাওয়া। চাহিদা হ্রাস পাইলে বাণিজ্যের পরিমাণ কমে, ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। অর্থাৎ, মন্দার সময় অর্থনীতিকে চাঙা করিতে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ানো প্রয়োজন। সরকার ব্যয় বৃদ্ধি করিলে সাধারণ মানুষের নিকট ব্যয়যোগ্য নগদের পরিমাণ বাড়ে, ফলে চাহিদাও বাড়ে। ভারত, চিন সহ বহু দেশ ইতিমধ্যেই রাজস্ব খাতে ব্যয় বৃদ্ধির নীতি স্থির করিয়াছে। কিন্তু, সকল প্রধান দেশ এই নীতি গ্রহণ করিলে একক ভাবে প্রতিটি দেশ নিশ্চিত হইতে পারে যে তাহার ব্যয় বৃদ্ধির সুফল অন্য দেশে চলিয়া যাইবে না। সুতরাং, বর্তমান সংকটের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তটি জরুরি ছিল। বর্তমান সংকটের দায় সার্বিক ভাবেই উন্নত দেশগুলির, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। কিন্তু বহু উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত অর্থনীতি এই সংকটের ফলে বিপর্যস্ত হইতেছে। বিশেষত রফতানির বাজারে মন্দা আসায় এই দেশগুলি বিপদে পড়িয়াছে। এই দেশগুলিকে আড়াল করিবার সিদ্ধান্তও এই বৈঠকে হইল। উন্নত দেশগুলি যাহাতে আমদানির ক্ষেত্রে বাধানিষেধ আরোপ না করিতে পারে, ওয়াশিংটন ডিক্লেয়ারেশন তাহা উল্লেখ করিয়াছে। এ ছাড়াও, ক্রেডিট রেটিং সংস্থাগুলির বিচার আরও কড়া করা, বিভিন্ন দেশের মধ্যে অধিকতর আর্থিক যোগাযোগ গড়িয়া তোলা, তথ্যের আদানপ্রদান ইত্যাদি বিষয়েও সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই বৈঠক বর্তমান আর্থিক সংকটকে কত দূর প্রতিহত করিতে পারিবে, সময়ই বলিবে, কিন্তু তাহার অভিমুখ যে ঠিক দিকে, তাহাতে সংশয় নাই।

ঘরের সমস্যা

অন্ধকার ক্রমে আসিতেছে, কাবুল অভিমুখে। অন্ধকার অবশ্য কাবুলের দিগ্‌বলয় ঘিরিয়াছে বহু দিন হইতেই। গত ২০০২ হইতে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি প্রায় কোনও মুহূর্তেই সন্ত্রাস-মুক্ত হয় নাই। ৯/১১-র পর যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবলিউ বুশের বাহিনী কাবুল অভিমুখে যাত্রা করে, তাহার পর ওই অঞ্চলে কয় দিন শান্তি বিরাজ করিয়াছে হাতে গনিয়া বলা সম্ভব। তবে সাম্প্রতিক কালে পরিস্থিতি বিস্তর পাল্টাইয়াছে। এখন প্রায় প্রত্যহ ঊষর আফগান প্রান্তরে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ। প্রায় প্রত্যহ তথাকথিত তালিবান-অধ্যুষিত অঞ্চলের উপর মার্কিন বোমারু বিমানের আক্রমণে হতাহতের সংখ্যাবৃদ্ধির সংবাদ। বিশেষ করিয়া পাক-আফগান সীমান্তের দুই দিকে দুই দেশের অভ্যন্তরেই এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ নৈরাজ্যের বিভীষিকা। গত সপ্তাহে রাজধানী কাবুলের সন্নিকটে জালালাবাদ শহরে যে গাড়ি-বিস্ফোরণটি ঘটিল, তাহাতে শতাধিক হতাহতের মধ্যে বহু স্কুলযাত্রী শিশুও রহিয়াছে। আফগানিস্তানও তবে প্যালেস্তাইনের নিয়তির দিকেই যাত্রা করিতেছে। সরকারি হিসাবেই রোজ এতগুলি প্রাণের ক্ষয়, অথচ বিশ্বময় নির্বিকারত্ব চোখে পড়িবার মতো। আফগানিস্তানে আক্ষরিক অর্থে যুদ্ধের পরিবেশ। অথচ আন্তর্জাতিক সচেতনতা এখনও অত্যল্প।

একটি মহল অবশ্য পুরাদস্তুর সচেতন, এবং ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা ছকিতে প্রস্তুত। তাহা ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নিজস্ব নীতি-নির্ধারক মহল। আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্রচার-পর্বেই ওবামা বারংবার নির্দেশ করেন, ইরাক নহে, আমেরিকার আসল মাথাব্যথার লক্ষ্য আফগানিস্তান। তাঁহার মতে, আফগানিস্তানের ২০০২-এর অভিযান সম্পূর্ণত শেষ না করিয়াই যে ইরাক অভিযান আরম্ভ করিয়াছিল পেন্টাগন, তাহা ছিল এক হিমালয়প্রমাণ ভ্রান্তি। তালিবানের মূল ঘাঁটি যেখানে ছিল, সেখানেই থাকিয়াই যায়, উপরন্তু তাহাদের নিকট এই বার্তা পৌঁছায় যে আমেরিকা তাহাদের সন্ত্রাসী যুদ্ধপদ্ধতির সহিত তেমন আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। ওবামা তাই একাধারে ইরাক হইতে মার্কিন সেনা যথাসত্বর সরাইয়া লইবার পক্ষপাতী, অন্য দিকে আফগান প্রান্তরের দিকে মার্কিন বিদেশনীতির অভিমুখ ঘুরাইবার পন্থী। আশা করা যাউক, বিদেশনীতি বলিতে আগামী মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেবল যুদ্ধ এবং বিমানহানাই বুঝিতেছেন না, কূটনীতিতেও তাঁহার আস্থা রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক সচেতনতা বাড়াইয়া, রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে চাপ বাড়াইয়া, আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই-এর সহিত সহযোগিতাপূর্ণ প্রতিরোধনীতির সাহায্যে যে কিছুই সাধন করা যাইবে না, তাহা বলিবার সময় কিন্তু আসে নাই। প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট মুশারফের সহিত মার্কিন কূটনৈতিক আদানপ্রদানের অভিজ্ঞতা সফল হয় নাই, কিন্তু বুশ-পর্বের সেই ব্যর্থতা-মণ্ডিত অধ্যায়ের ভারে নূতন প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই প্রথম হইতেই ন্যুব্জ নহেন। বিশ্বময় অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার সহিত প্রথম হইতেই আফগান সংকটও বহুপাক্ষিক ভাবে মোকাবিলার প্রয়াস লইবেন ওবামা, এই প্রত্যাশায় রহিল বিশ্ব, বিশেষত পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়া। তাহাদের নিকট আফগানিস্তান সমস্যা কেবল একটি সুদূরবর্তী আন্তর্জাতিক দুর্ভাবনা নয়, একেবারে নিজের ঘরের সমস্যা।

বারাক ওবামা: একটি গণতান্ত্রিক রূপকথা

শুধু কৃষ্ণাঙ্গ নয়, ওবামা সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ব্যাপক সংখ্যায় ভোট দিতে আসতে উদ্বুদ্ধ করলেন। কেবল তা-ই নয়, তাঁর জয়ের পিছনে শ্বেতাঙ্গ ভোটের ভূমিকাও বিরাট। লিখছেন মৈত্রীশ ঘটক।

আজ প্রথম পর্ব

বারাক শব্দটির অর্থ ধন্য। তাই আক্ষরিক অর্থেও স্বনামধন্য বারাক ওবামা। আর, মধ্যনাম হল হুসেন, যার অর্থ হল সুদর্শন। রূপকথার, অন্তত গণতান্ত্রিক রূপকথার রাজপুত্র হিসেবে তাঁকে ভাবাই যায়।

কিন্তু, তিনি রাজপুত্র নন। কেনিয়ার এক দরিদ্র গ্রাম থেকে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার্থে আসা এক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ, আর তাঁর সহপাঠিনী আমেরিকার এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শ্বেতাঙ্গ নারীর সন্তান। ওবামার জন্ম আমেরিকার হাওয়াই রাজ্যে ১৯৬১ সালে। তখন তাঁর মতো অ-শ্বেতাঙ্গ মানুষের প্রেসিডেন্ট হওয়া দূরের কথা, ভোট দেওয়ার অধিকার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আমেরিকায় সিভিল রাইটস আন্দোলনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সেনেটে ওবামাকে বাদ দিলে মাত্র দুজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ নির্বাচিত হয়েছেন গত চল্লিশ বছরে। হ্যাঁ, গত চল্লিশ বছরে এক শত আসনের সেনেটে কৃষ্ণাঙ্গদের উপস্থিতি হয় শূন্য, নয়তো মাত্র এক। যেখানে তাঁরা জনসংখ্যার প্রায় ১৩ শতাংশ। তাঁর আগে আর এক জন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ জেসি জ্যাকসন ১৯৮৪ সালে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাথমিক পর্যায়ের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কিঞ্চিৎ সাফল্য অর্জন করেন। ১৮ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি হারেন ওয়াল্টার মন্ডেল-এর কাছে, যাঁকে হারিয়ে রোনাল্ড রেগন রাষ্ট্রপতি হন। জ্যাকসনের সমর্থন মূলত আফ্রিকান-আমেরিকানরাই। কলিন পাওয়েল বা কন্ডেলিজা রাইস সরকারের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউ নির্বাচিত হননি, নিয়োজিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতো আর্থিক দিক থেকেও, এখনও তাঁরা পিছিয়ে আছেন বাকি বর্ণের মানুষদের থেকে। তাঁদের মধ্যে বেকারত্বের হার শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বেকারত্বের হারের প্রায় দ্বিগুণ। সাদা পরিবারের গড় বাৎসরিক আয়ের থেকে তাঁদের গড় বাৎসরিক আয় প্রায় ৪০ শতাংশ কম (২০০৪)। মার্কিন কারাগারে বন্দিদের ৪৪ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ। এই আমেরিকার ৪৪তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন বারাক ওবামা ৫২ শতাংশ ভোট পেয়ে। আমেরিকা কেন, পাশ্চাত্যের কোনও দেশেই অ-শ্বেতাঙ্গ কোনও রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হননি।

কী করে সম্ভব হল

এক দিক থেকে দেখলে উত্তরটা খুব সোজা। ইরাক যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং গত আট বছরে জর্জ বুশের অপশাসনে অতিষ্ঠ আমেরিকানরা যে রিপাবলিকান পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইবেন, এ তো স্বাভাবিক। নির্বাচনের আগের সমীক্ষা অনুসারে বুশ সরকারের কাজে সন্তুষ্ট ২৪ শতাংশ মার্কিন, যা সাম্প্রতিক ইতিহাসে সর্বনিম্ন (ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির পর পদত্যাগের ঠিক আগে নিক্সনের ওই একই জন-সন্তোষের হার ছিল)।

আর এক দিক থেকে দেখলেও উত্তরটা সোজা। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বাগ্মিতায় উজ্জ্বল এক নক্ষত্র তিনি, বর্ণনির্বিশেষে রাজনীতির জগতে যাঁর তুলনা সাম্প্রতিক কালে আমেরিকা কেন, অন্য কোনও দেশেও মেলা ভার। ঠিকই, ওবামা-মুগ্ধতার (যাকে বলা হচ্ছে ওবামানিয়া) সংক্রমণ থেকে সাবধান থাকা উচিত। কিন্তু, তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের কথা শুনুন। ম্যাকেন সমর্থক এবং গোঁড়া রক্ষণশীল সাংবাদিক ফ্রেড বার্নস সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, '...হি ইজ আ কলোসাস অ্যাসট্রাইড দ্য কন্টিনেন্ট, দ্য মোস্ট কম্যান্ডিং পলিটিক্যাল প্রেজেন্স সিন্স রোনাল্ড রেগান অ্যারাইভড্ ইন ওয়াশিংটন। হি ইজ দ্য স্টার।' এখানে বলা উচিত যে, রেগানের সঙ্গে তুলনা করা, এক জন রিপাবলিকানের কাছে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করার সমান। আর, আমেরিকার আধুনিক রক্ষণশীল আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা উইলিয়াম বাকলের পুত্র লেখক ক্রিস্টোফার বাকলে, বুশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী কলিন পাওয়েল, ম্যাসাচুসেটসের প্রাক্তন রাজ্যপাল উইলিয়াম ওয়েল্ড এ রকম অনেক আজীবন রিপাবলিকান নিজেদের ওবামার সমর্থক বলে ঘোষণা করেন নির্বাচনের আগে (এঁদের বলা হচ্ছে ওবামাকান)। এঁদের সবার মত-ই প্রায় এক: ওবামার মতো প্রতিভা রাজনীতির জগতে বিরল।

এক দিকে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকার করুণ চালচিত্র, শতাব্দী-সঞ্চিত বৈষম্যের বিষময় উত্তরাধিকার, আর অন্য দিকে দীপ্তিমান এই তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ নেতা, যিনি ঐক্যের আর আশার মন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হলেন আমেরিকার ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে। তিনি শ্বেতাঙ্গ হলে এই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকত না। এই হল রূপকথার পটভূমিকা। এ বার আসা যাক তথ্য বিশ্লেষণে।

কারা ভোট দিয়েছেন ওবামাকে

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে, তা হল শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট তিনি পাননি *(প্রথম সারণি)*। তিনি পেয়েছেন ৪৩ শতাংশ আর শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আর নারীর ভোট আলাদা করে ধরলে তিনি পেয়েছেন, যথাক্রমে ৪১ শতাংশ আর ৪৬ শতাংশ। যে যে গোষ্ঠীর মানুষের কাছে তিনি সব মিলিয়ে যা ভোট পেয়েছেন (অর্থাৎ ৫৩ শতাংশ), তার থেকে বেশি হারে ভোট পেয়েছেন, তাঁরা হলেন নারী (৫৬ শতাংশ), শ্বেতাঙ্গ বাদ দিলে আর সমস্ত বর্ণের মানুষ: কৃষ্ণাঙ্গ (৯৫ শতাংশ), হিসপানিক (৬৭ শতাংশ, এঁরা মূলত প্রবাসী মেক্সিকান) এবং এশীয় (৬২ শতাংশ)। আর আছেন যুবসমাজ (৬৬ শতাংশ), প্রথম বার যাঁরা ভোট দিয়েছেন, যাঁরা আর্থিক দিক থেকে অসচ্ছল (৬০ শতাংশ) এবং যাঁরা রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে উদারপন্থী (৮৯ শতাংশ)। যদিও, শুধু শ্বেতাঙ্গরা ভোট দিলে ওবামা হারতেন, শ্বেতাঙ্গ যুবসমাজের (মোট ভোটারদের ১১ শতাংশ) সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৪ শতাংশ) ভোট তিনি পেয়েছেন।

তার মানে, ওবামা জিতলেন কি যুবসমাজ এবং সামাজিক আর অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের ভোটে? এর সরল উত্তর হল: হ্যাঁ। কিন্তু, এই প্রত্যেকটি শ্রেণি চিরকাল ডেমোক্র্যাটদেরই ভোট দিয়ে আসছেন। তা হলে কী করলেন ওবামা, যা কেরি করতে পারেননি? কেরি বুশের কাছে হেরেছিলেন ৩ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে। আর, ওবামা জিতেছেন ৭ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে। এই ১০ শতাংশ ভোট কী করে ওবামা ছিনিয়ে আনলেন রিপাবলিকানদের কাছ থেকে?

নতুন ভোট পাওয়ার সৎ উপায় তো মোটে দুটো: নতুন ভোটার বা যে ভোটার এমনিতে ভোট দিতে যান না, তাঁকে ভোট দিতে আসতে রাজি করানো, নয়তো বিপক্ষের দিকে ঝোঁকা ভোটারের মন জয় করা। অসৎ উপায় অবশ্যই অগুন্তি। আমেরিকায় অনেক সময়েই অভিযোগ ওঠে যে, রিপাবলিকান দল কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের ভোট দেওয়ার পথে নানা অন্তরায় সৃষ্টি করেন। সে যা-ই হোক, কেরির সঙ্গে ওবামার তুলনা করতে গেলে এই দুই দিকই দেখতে হবে। অর্থাৎ, কত নতুন ভোটার টানতে সক্ষম হয়েছেন ওবামা আর কোন ভোটাররা দল বদলেছেন।

এই নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল বেশি, তবে যতটা ভাবা হয়েছিল, ততটা হয়তো না। প্রাথমিক গণনা অনুসারে (এখনও পত্রযোগে প্রেরিত ভোটগণনা সম্পূর্ণ হয়নি) ৬১.২% মানুষ ভোট দেন। ২০০৪ সালে এই হার ছিল ৬০.১%। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণির ভোটারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব মন দিয়ে দেখলে কতকগুলো খুব উল্লেখযোগ্য ব্যাপার দেখা যাবে। ২০০৪ সালে মোট ভোটারদের ৭৭% ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। এ বারে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৪% (প্রথম সারণি)। তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ এবং হিসপানিক ভোটারদের ভাগ বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ১১% থেকে ১৩% আর ৮% থেকে ৯%। আর, ভোটারদের মধ্যে আপেক্ষিক গুরুত্ব বেড়েছে যুবসমাজের। তাঁদের ভাগ ১৭% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮%। এই প্রত্যেকটি গোষ্ঠী, আমরা আগেই দেখেছি, বিপুল ভাবে ওবামার সমর্থক। এঁরা যে যে হারে ওবামাকে ভোট দিয়েছেন, তা দিয়ে তাঁদের মধ্যে থেকে আসা এই বাড়তি ভোটারের সংখ্যাকে গুণ করলে পাই ৩.২%। আর, কেরি বুশের কাছে হেরেছিলেন ৩% ভোটের ব্যবধানে! সুতরাং, ওবামার জয়ের এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

এ বার আসি কেরি আর ওবামার তুলনায়। দ্বিতীয় সারণিতে দেখা যাবে যে, গত বারে যাঁরা বুশকে ভোট দিয়েচিলেন, তাঁদের ১৭% ওবামাকে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু, গত বারে যাঁরা কেরিকে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের ৯% ম্যাকেনকে ভোট দিয়েছেন। তার মানে, ওবামার নিট লাভ ৮% দল বদল করা ভোটার। আর, ওবামা জিতেছেন ৭% ব্যবধানে!

তার মানে, কিছু ডেমোক্র্যাটের কাছে নিশ্চয়ই তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণ কাজ করেনি। কারণ, তা না হলে যুদ্ধ এবং অর্থনীতি নিয়ে সারা দেশে রিপাবলিকান-বিরোধী হাওয়া গত বারের তুলনায় অনেক জোরদার ছিল। এঁরা সবাই বর্ণবিদ্বেষী না-ও হতে পারেন, তবে সে-সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু, ভাল খবর এই যে, কিছু রিপাবলিকান সমর্থক ওবামার গুণে মুগ্ধ হয়ে কিংবা দেশের হালে তিতিবিরক্ত হয়ে তাঁকে ভোট দেন। এঁদের সংখ্যা বেশি। অন্য ভাবে দেখলেও এই প্রবণতা চোখে পড়ে। যেমন, যাঁরা নিজেদের রক্ষণশীল বর্ণনা করেন, তাঁদের ১৫% কেরিকে ভোট দিয়েছিলেন, আর ২০% ওবামাকে। একই ব্যাপার যাঁরা নিজেদের মধ্যপন্থী বলে বর্ণনা করেন তাঁদের ক্ষেত্রেও। মধ্যপন্থী বা রক্ষণশীলদের কাছ থেকে ওবামা যে কেরির তুলনায় বাড়তি ভোট পেয়েছেন, তার জন্য তিনি রিপাবলিকানদের থেকে ছিনিয়ে এনেছেন যথাক্রমে ২.৭% এবং ১.৭% ভোটের ব্যবধান। অর্থাৎ, ওবামার সমর্থন শুধু তরুণ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আসেনি।

এ বার আসা যাক শ্বেতাঙ্গদের ভোটের আর একটু বিস্তারিত আলোচনায়। প্রথম সারণিতে আর এক বার তাকালে দেখা যাবে ভোটারদের প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর কাছ থেকে কেরির তুলনায় বেশি ভোট পেয়েছেন ওবামা। এমনকী, শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকেও (পুরুষ, নারী, মোট)। শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে তিনি শুধু কেরির থেকে বেশি হারে সমর্থন পাননি। জিমি কার্টারকে বাদ দিলে গত তিন দশকে কোনও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী এত সমর্থন পাননি। শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে কেরির তুলনায় ওবামা যে ২% বেশি ভোট পেয়েছেন, তার অবদান ম্যাকেনের সঙ্গে ১.৫% ভোটের ব্যবধান (তার কারণ মোট ভোটারদের তাঁরা প্রায় তিন-চতুর্থাংশ)। শুধু এর ভিত্তিতে তিনি জেতেন না। কিন্তু মোট ভোটের ব্যবধান যেখানে ৭%, সেখানে এই ১.৫%-এর অবদান অগ্রাহ্য করার মতো-ও নয়।

তাঁর জেতার পিছনে তাই শ্বেতাঙ্গদের ভোটেরও অবদান আছে। যদিও তা নতুন ভোটার, যুব সমাজ এবং অ-শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের অবদানের তুলনায় কম। অন্য ভাবেও এটা দেখা যায়। ওবামা জিতেছেন (এবং কেরি হেরেছিলেন) কিছু কিছু রাজ্যে, যেগুলি হয় রিপাবলিকানদের সাবেক ঘাঁটি বলে পরিচিত (যেমন, ইন্ডিয়ানা, ভার্জিনিয়া, নর্থ ক্যারোলিনা), নয়তো যেখানে দুই দলের তীব্র প্রতিযোগিতা (ওহায়ো, পেনসিলভ্যানিয়া, ফ্লোরিডা)।

ওবামা তা হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ (শুধু কৃষ্ণাঙ্গ নয়) আর যুবসমাজকে ব্যাপক সংখ্যায় ভোট দিতে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ভয় ছিল যে, শ্বেতাঙ্গরা অনেকে তাঁকে শেষ পর্যন্ত ভোট দেবেন না। কিছু শ্বেতাঙ্গ ভোটারের ক্ষেত্রে এটা সত্যি হলেও, তাঁদের থেকে বেশি সংখ্যায় যে শ্বেতাঙ্গরা কেরিকে ভোট দেননি, তাঁরা ওবামাকে ভোট দিয়েছেন। তাই, শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও (যা লিন্ডন জনসন-এর পর অন্য কোনও ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীও পাননি), তাঁদের ভোট আকর্ষণে তিনি অন্য ডেমোক্রাটদের তুলনায় সফল। *(চলবে)*

সারণি-১ কে কী ভাবে ভোট দিলেন

ভোটদাতা	মোট ভোটদাতার শতাংশ ২০০৪	মোট ভোটদাতার শতাংশ ২০০৮	সমর্থন কেরি	সমর্থন ওবামা
শ্বেতাঙ্গ	৭৭	৭৪	৪১	৪৩
কৃষ্ণাঙ্গ	১১	১৩	৮৮	৯৫
হিস্পানিক	০৮	০৯	৫৩	৬৭
এশীয়	০২	০২	৫৬	৬২
অন্য	০২	০৩	৫৪	৬৬
মোট	১০০	১০০	৪৮	৫৩

তথ্যসূত্র: সি এন এন

সারণি-২ ২০০৪ সালের নির্বাচনে দলের প্রার্থীর পাওয়া ভোটের কত শতাংশ ২০০৮ সালের প্রার্থীরা পেলেন

আগের নির্বাচনে ভোট	মোট ভোটের শতাংশ	ওবামা	ম্যাকেন
কেরি	৩৭	৮৯	০৯
বুশ	৪৬	১৭	৮২
ভোট দেননি	১৩	৭১	২৭

লেখক লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অর্থনীতির শিক্ষক

সম্পাদক সমীপেষু

মানবেন্দ্রনাথ রায় কিন্তু মেক্সিকোর প্রতিনিধি ছিলেন

২২ জুলাই প্রকাশিত 'প্রতীকী রাজনীতির বিপদ'-এর উত্তরে ২৪ অগস্ট প্রকাশিত চিঠিতে উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, ১৯২০ সালের জুলাই মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অধিবেশনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ এশীয় সদস্য। কিন্তু বাস্তবিক তিনি এশীয় সদস্য রূপে অধিবেশনে যোগ দিতে যাননি। তিনি ছিলেন মেক্সিকান কমিউনিস্ট পার্টিরও প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই সময়ে লেনিনের উপদেশে ও মাইকেল বরোদিনের আমন্ত্রণে তিনি মেক্সিকো থেকেই মস্কো অধিবেশনে গিয়েছিলেন মেক্সিকোর প্রতিনিধি হিসাবে। (সূত্র: লেফটিজম ইন ইন্ডিয়া, ১৯১৭-১৯৪৭ সত্যব্রত রায়চৌধুরী, প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান, ইংল্যান্ড, ২০০৭)

মানবেন্দ্রনাথ রায়

দ্বিতীয়ত, লেনিন তাঁর রচিত 'Theses on Naional and Colonial Questions'-এ যে উপনিবেশের প্রকৃত প্রতিনিধির উপস্থিতি চেয়েছিলেন, সেটিও আসলে ওই প্রতীকী উপস্থিতিই এবং বাস্তবিক কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। তাই সেটি উল্লেখের বিশেষ দাবি রাখে না। বাস্তবিক কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কারণ, লেনিন আসলে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের বিকেন্দ্রীকরণ করে ঔপনিবেশিক দেশগুলির বামপন্থী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব তুলে দিয়েছিলেন উপনিবেশ সৃষ্টিকারী দেশগুলিরই হাতে। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পান ব্রিটেন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি, যে দেশ কিনা নিজেই ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে রেখেছে।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। তাত্ত্বিক ভাবে তা ঠিক হলেও বাস্তবে তা ঠিক ছিল না। বরং, পরাধীন ভারতে তিনি ব্রিটেনের কমিউনিস্টদের দ্বারা ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বের ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। (দ্রষ্টব্য: এম এন রায়: এ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি, : সমরেন রায়, ওরিয়েন্ট লংম্যান, পৃ: ১০৫-৬)।

সুতরাং, বলা যেতে পারে যে, ভারতের কমিউনিস্টরা মূল স্রোতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের জাত যাবে না বলে লেনিন ভাবলেও, আদপে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্টদের জন্য জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোনও কাজের কাজই করতে পারেননি। মানবেন্দ্রনাথ রায়ও কিন্তু অন্তত অন্য সব কট্টর বামপন্থীদের থেকে ভারতের মূল স্রোতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বেশি যুক্ত ছিলেন। সুতরাং, 'রায় মনে করেছিলেন যে, জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীদের সঙ্গে কমিউনিস্টরা কখনওই ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন না'— এই মন্তব্যও ধোপে টেকে কি? বরং, কমিনটার্নের মতো অগ্রাহ্য করে রায় চেয়েছিলেন ভারতীয় বামপন্থীদেরও জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সমান ভাবে যোগদান করাতে। উপনিবেশবাদীদের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির ব্যবহারিক বিরোধ না থাকলে রায় কেন জাতীয় নেতাদেরও কারও কারও কাছে আসতে পেরেছিলেন?

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, এ কথা ভুল যে, ভারতীয় কমিউনিস্টরা রায়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি ঔপনিবেশিক দেশসমূহ গণ-অভ্যুত্থানের পদ্ধতি সম্বন্ধে রায়ের গবেষণাকেই 'এ দেশের (বামপন্থী) নেতারা আঁকড়ে ধরে আছেন'। রায়ের বাস্তবজ্ঞান ও দূরদর্শিতা আজও বাম নেতাদের কাছে প্রণিধানযোগ্য তা প্রথমেই বলেছি। কিন্তু, লেনিন, বা ধরতে গেলে মুজফ্‌ফর আহমদও, যিনি রায়ের কাছেই বামপন্থী ভাবধারায় দীক্ষিত হন, তাঁদের ছবি মালাতে ঢেকে গেলেও বাম কার্যালয়গুলিতে রায়ের ছবিও দেখা যায় কি? এখনকার 'উচ্চ সারি'র গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রিক বাম নেতাদের মুখে তো রায়ের নাম তেমন একটা শোনা যায় না!

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ঔপনিবেশিক দেশসমূহে গণ-অভ্যুত্থানের পদ্ধতি সম্বন্ধে লেনিনের গবেষণা বাতিল হয়নি, বরং তারই পরিপূরক রূপে রায়ের গবেষণাপত্র গৃহীত হয়েছিল। আমার প্রশ্ন, দুটো ভিন্নধর্মী আদর্শ একে অন্যের পরিপূরক হয় কী ভাবে?

যে প্রশ্নে রায়ের দ্বারা লেনিনকে 'পরিপূরণ' করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, অন্তত সেই প্রশ্নে রায়ের গ্রহণযোগ্যতা কি লেনিনের গবেষণার অপ্রয়োজনীয়তাকেই নির্দেশ করে না? ভি বি কার্নিক বলেছিলেন, "By adopting Roy's Thesis, alternative to Lenin's, the Party consolidated Roy's position among the orthodox communists." (সূত্র: এম এন রায়, ভি বি কার্নিক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নিউ দিল্লি, ১৯৮০, পৃ: ৪২) কোনও প্রশ্নেই বা বিকল্পের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল কেন?

তথাগত রায়চৌধুরি। মুম্বই-৪০০০২৬

কলকারখানায় ছাঁটাই কি খবর নয়?

জেট এয়ারওয়েজের ১৯০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘটনা নিয়ে (১৭/১০) সারা দেশ জুড়ে যে তোলপাড় ঘটে গেল সে বিষয়ে দু-চার কথা বলতে চাই। যে কোনও মানুষের জীবিকা হারানোর ঘটনাই অত্যন্ত দুঃখজনক। জেটের ১৯০০ কর্মীকে সাময়িক ভাবে জীবিকা হারানোর দু-দিনব্যাপী যে যন্ত্রণা পেতে হয়েছে তা-ও অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু ঘটনাটি নিয়ে যে মাত্রায় কাগজ ও টিভি-তে প্রতিনিয়ত লেখালেখি ও প্রচার চলেছে তা বিরক্তিকর। এই প্রচারের সামান্য উৎসাহ আমরা দেখি না কোনও কলকারখানা বন্ধ হয়ে এক সঙ্গে কয়েক হাজার মানুষের জীবিকা হারানোর সময়। সে খবর থাকে ভিতরের পাতায় কোণের দিকে।

দুটি ক্ষেত্রে কাজ হারানোর ঘটনাই কিন্তু সমান দুঃখজনক। দুটি ঘটনাই কিন্তু সমান প্রচার বা রাজনৈতিক উদ্যোগ দাবি করে। কিন্তু কলকারখানার শ্রমিকের জীবিকা হারানোর খবর এত ফলাও করে প্রচার পায় না কেন?

জেটের কর্মচারীরা কাজ ফিরে পেয়েছেন তা অত্যন্ত আনন্দের কথা। এটাও সত্যি যে, তাঁরা জেট এয়ারওয়েজের কাছে ফিরে না গেলেও অন্যত্র প্রায় সমমানের কাজ পেতেন। কারণ, তাঁদের বয়স কম এবং তাঁদের দক্ষতা যথেষ্ট। কিন্তু কাজ হারানো কারখানার শ্রমিকরা আর তেমন কোনও কাজ পান না, তাঁদের বেশির ভাগেরই বেশি বয়স ও সীমিত দক্ষতার জন্য। তাঁরা মুক্তি পান একবেলা একমুঠো খেয়ে বা রাস্তায় ভিক্ষে করে, বা আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে।

তন্ময় ঘটক। বি গার্ডেন, হাওড়া

গাড়িই কিন্তু মোক্ষ নয় গণ-পরিবহণ উন্নত হোক

প্রদীপ দত্ত

গাড়ি-শিল্পে মন্দার ঢেউ এ দেশে সম্প্রতি এলেও আমেরিকায় তার প্রভাব টের পাওয়া গিয়েছে বেশ কিছু দিন। সে দেশের সবচেয়ে বড় গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি জেনারেল মোটর্স (জি এম)-এর চিফ একজিকিউটিভ রিক ওয়াগোনার জুন মাসেই জানিয়েছিলেন যে তাঁরা চারটি ট্রাক নির্মাণের কারখানা বন্ধ করে দেবেন। আগের তিন বছরে জি এম ৫১০০ কোটি ডলার ক্ষতি স্বীকার করেছে। গাড়ির চাহিদা কমেছে। জি এম মনে করে চাহিদার এই পরিবর্তন স্থায়ী হবে। যে সব গাড়ির মাইলেজ কম তার উৎপাদন তারা কমিয়ে ফেলবে। ট্রাকের বদলে ২০১০ সালের মধ্যে তারা বাজারে কমপ্যাক্ট ইলেকট্রিক কার আনছে।

২০০৭ সালে ফোর্ড কোম্পানির বার্ষিক ক্ষতি ছিল ১২৭০ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের এই দ্বিতীয় বৃহৎ মোটরগাড়ি নির্মাতা কোম্পানি জানিয়েছে যে ২০০৯ সালে ওহায়ো-র কাছে ক্লিভল্যান্ডের ব্রুক পার্ক কাস্টিং প্ল্যান্ট তারা বন্ধ করে দেবে। সেখানে কর্মরত ১২১৮ জন। মে মাসে ক্লিভল্যান্ড ইঞ্জিন প্ল্যান্ট বন্ধ করে দিয়েছে। কাজ করতেন ৫৭৭ জন। এর আগে তারা ৯টি কারখানা বন্ধ করেছে এবং ২০১২ সালের মধ্যে মোট ১৬টি কারখানা বন্ধ করে দেবে বলে জানিয়েছে। তাদের প্রায় ২৫ হাজার কর্মী স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন। ফোর্ড কোম্পানিও বৈদ্যুতিক মোটরগাড়ি বার করতে চলেছে। বেশির ভাগ বড় গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি ২০০৯ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে তারা বাজারে যে-সব গাড়ি আনছে, সেখানে তেলের ব্যবহার থাকছে না। জাপানেও পরিবর্তনের হাওয়া। টয়োটা কোম্পানি ২০০৯ সালে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি চালু হতে চলেছে। শোনা যাচ্ছে ওই গাড়িতে সৌরকোষ থেকেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে। নিশান ২০১০ সালের মধ্যে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে বৈদ্যুতিক গাড়ি চালু করবে বলে জানিয়েছে। হোন্ডা-ও ব্যাটারি-চালিত গাড়ি আনতে তৈরি হচ্ছে। মাজদা ২০০৯-এর মার্চে হাইড্রোজেন-গ্যাসোলিন হাইব্রিড গাড়ি চালু করছে।

গাড়ি চলছে। দু'-চাকা। ছবি: এ এফ পি

শোনা যায়, বিভিন্ন মার্কিন সংস্থার পদস্থ কর্তারা অনেকেই অফিসে আসেন মেট্রো রেল চড়ে, গাড়িতে করে নয়। কারণ গাড়ি পার্ক করাই সমস্যা।

বিদ্যুৎ-চালিত

প্লাগ-ইন গাড়ির ক্ষেত্রে গাড়ির ব্যাটারিতে বৈদ্যুতিক সকেটের মাধ্যমে মেইন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ব্যাটারির ক্ষমতা যদি কমে যায় তখন পেট্রল-চালিত ইঞ্জিনের মাধ্যমে গাড়ি চলবে। প্রতিটি গাড়ি যদি প্রথম ৫০ কিলোমিটার পেট্রোলের বদলে ব্যাটারির মাধ্যমে চালানো যায় বার্ষিক পেট্রল খরচ অর্ধেকে নেমে আসবে। ১ লিটার পেট্রোলে যতটা পথ যাওয়া যায় সেই পথ অতিক্রম করতে বিদ্যুৎ খরচ হয় ২৫ সেন্ট। বেশি রাতে যখন বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত এবং নষ্ট হয় সে সময় গাড়ির ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ সংযোগ করে নিলে বাড়তি বিদ্যুৎ সেখানে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিদ্যুৎ কী ভাবে তৈরি হচ্ছে তা-ও অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ।

এলন মাস্কের নতুন প্লাগ-ইন স্পোর্টস কার বাজারে এসেছে এ বছরের মার্চ মাসে। ক্যালিফোর্নিয়া লাইটিং কার কোম্পানি বাজারে একই ধরনের স্পোর্টস কার আনতে চায়। জেনারেল মোটর্স ২০১০ সালের মধ্যে প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি 'ভোল্ট' বাজারে আনতে প্রস্তুত হচ্ছে। টয়োটা 'প্রায়াস'-এর প্লাগ-ইন রূপ দিতে চায়। তবে হোন্ডা ও মার্সিডিজ জ্বালানি কোষ-চালিত গাড়িতেই বেশি উৎসাহী।

সূর্যের আলো যেখানে রয়েছে সেখানে প্লাগ-ইন-এ সৌরকোষ থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে। গুগল এরই মধ্যে ফটোভোল্টাইক কার পার্ক তৈরি করেছে। কর্মচারীদের গাড়ির মাথার ওপরে আচ্ছাদন হিসাবে থাকছে সৌরকোষ যা গাড়িকে রিচার্জ-ও করে। এই ব্যবস্থা ব্যাপক ভাবে চালু হতে চলেছে। সুপারমার্কেটে এই ব্যবস্থা চালু হলে গাড়ির ভিড় বাড়বে। দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়িকে রিচার্জের ব্যবস্থার যত দ্রুত প্রসার হবে, প্লাগ-ইন গাড়ি বিক্রির সম্ভাবনাও তত বাড়বে। এ ধরনের গাড়িতে বর্তমানে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞেরা সস্তায় গাড়ি-কারখানার ক্ষেত্রেও আপত্তি করেন। বিশেষত ভারতে। এ দেশের মধ্যে দিল্লিতে সবচেয়ে বেশি রাস্তা রয়েছে, অথচ সেখানেও পার্কিং আর যানজটের সমস্যা। পরিবেশের বিপদের কথা বাদ দিলেও এত গাড়ি থাকবে কোথায়? চলবে কোথায়? শোনা যায়, বিভিন্ন মার্কিন সংস্থার পদস্থ কর্তারা অনেকেই অফিসে আসেন মেট্রো রেল চড়ে, গাড়িতে করে নয়। কারণ গাড়ি পার্ক করাই সমস্যা। সুতরাং বিশেষজ্ঞদের মত, গাড়ি-কারখানার বদলে গণ-পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার।

দিল্লির সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট এবং এন ডি টিভি এক সমীক্ষা রিপোর্টে জানিয়েছে, বেশির ভাগ মানুষ চান বাসের সংখ্যা ও রাস্তা বৃদ্ধি এবং নতুন বাস-করিডর তৈরি করা হোক। যিনি হাঁটেন, সাইকেল চড়েন কিংবা সরকারি, বেসরকারি গণ-পরিবহণ ব্যবস্থা করেন তিনিই বেশি সমাজবন্ধু, পরিবেশবন্ধু— নানা দেশে এ কথা উঠছে। দেখা যাচ্ছে বিশ্বায়নের যুগে পরিবেশ-ভাবনায় এখনও বিশ্বায়ন ঘটেনি। তবে মোটরগাড়ির যে দিনশেষের ঘণ্টা বেজেছে, তা নিশ্চিত।

20081119_ABP_NOR_000_004.pdf 19/11/2008 08:54 AM Page 1

NE

বন্দে মাতরম

আনন্দবাজার পত্রিকা

৮৭ বর্ষ ২৪১ সংখ্যা বুধবার ৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ শিলিগুড়ি

গণতন্ত্রের অভিমুখে

জম্মু-কাশ্মীরে সাত দফা বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা নির্বিঘ্নেই সমাপ্ত হইয়াছে। আশঙ্কা ছিল, নির্বাচন বানচাল করিতে এবং বানচালকারীদের মোকাবিলা করিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সেনাবাহিনী উভয় পক্ষই ব্যাপক হিংসার আশ্রয় লইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ধরনের কোনও অপ্রীতিকর ঘটনাই ঘটে নাই। বস্তুত, বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন যে রূপ হিংসাত্মক হইয়া থাকে, কাশ্মীর উপত্যকায় তাহার লেশমাত্রও দেখা গেল না। অথচ বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়ত সম্মেলনের নেতারা নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়াছিলেন। তাঁহারা দাবি করিতেন, শ্রীনগর উপত্যকার মুসলিম জনসমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি তাঁহারাই। কিন্তু দেখা গেল, তাঁহাদের বয়কটের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া গড়ে ৫০ শতাংশের অধিক ভোটার বুথে পৌঁছাইয়া গিয়াছেন। গুরেজের মতো কোনও-কোনও কেন্দ্রে ৭৪ শতাংশ পর্যন্ত ভোট পড়িয়াছে। সংশয়বাদীদের ধারণা ছিল, অমরনাথ তীর্থকেন্দ্রকে জমি দানের প্রতিবাদে জাগিয়া ওঠা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে স্বাধীন কাশ্মীরের হুরিয়তি স্লোগানে অধিকাংশ কাশ্মীরিই গলা মিলাইবেন। বাস্তবে দেখা গেল, সেনাবাহিনীর আচরণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের তীব্র ক্ষোভ থাকিলেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শামিল হওয়ার ব্যাপারে কাশ্মীরিদের আগ্রহের খামতি নাই। ভোটদানে উৎসাহী তরুণদের মধ্যে এমনকী বেশ কিছু প্রাক্তন জঙ্গিও ছিলেন, যাঁহারা এখন মনে করেন, অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র ছাড়া বিকল্প নাই। পশ্চিমি দেশের গণমাধ্যম ও পর্যবেক্ষকরা অতীতে কাশ্মীরের নির্বাচনকে প্রহসন আখ্যা দিয়াছেন এবং এ বারেও ‘লোকদেখানো ভোট’ বলিয়া তির্যক মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ভোট দানে কাশ্মীরিদের উদ্দীপনা দেখিয়া নিন্দা বন্ধ করিতেছেন।

এই অভিজ্ঞতা একটি মৌলিক বার্তা আনিয়া দেয়। দীর্ঘ দেড় দশক ধরিয়া বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস ও তাহার মোকাবিলায় সরকারি দমননীতির জাঁতাকলে পড়িয়া থাকা আপামর কাশ্মীরি জনসাধারণ এ বারে শান্তি ও স্থিতি চান। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের সহিত বর্ধমান সংযোগ অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই, বিচ্ছিন্নতার কল্পনাও খানিক ম্রিয়মাণ হইয়া আসিয়াছে। সম্ভবত তাই গণতন্ত্রের নিরীক্ষার প্রতি তাঁহাদের উৎসাহ বাড়িয়াছে। এই উদ্দীপনাকে ভারতের অঙ্গরাজ্য হইবার ইচ্ছা বলিবার প্রয়াসটি হইবে অতি-সরলীকরণ। নির্বাচনে অংশ লইতে আগ্রহী হইয়াছেন বলিয়াই যে কাশ্মীরের জনসাধারণ ভারতীয় পরিচয়টিই বরণ করিয়া লইতে চাহেন, তাহা না-ও হইতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত যাহা, তাহা হইল, তাঁহারা যে পন্থাই গ্রহণ করুন না কেন, সম্ভবত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই তাহা করিতে চাহেন। অর্থাৎ এই শান্তিময় নির্বাচনকে ভারতের প্রতি সমর্থন না ধরিয়া গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতির প্রতি আস্থা হিসাবে ধরা উচিত। অতঃপর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রকাশের মধ্য দিয়া তাঁহারা কোন পথে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা ও উন্নয়নের সন্ধান করিবেন, তাহা ভবিষ্যৎই বলিবে। সেনাবাহিনীর বিপুল উপস্থিতি নিশ্চয় তাঁহাদের পক্ষে পীড়াদায়ক, কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাই যে দীর্ঘকালীন অশান্তি ও অত্যধিক সামরিক নির্ভরতাকে অপ্রাসঙ্গিক করিয়া দিতে পারে, তাহা সম্ভবত তাঁহারা উপলব্ধি করিতেছেন। তাই বিধানসভা নির্বাচনকে তাঁহারা একটি সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা এমনই এক সুযোগ, যাহা এমনকী বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থককেও নির্বাচিত হওয়ার এবং প্রতিনিধিসভায় নিজ অভিপ্রায় ও লক্ষ্যের সমর্থনে বিতর্ক চালাইবার সুযোগ দেয়। ভিন্ন মত প্রকাশের এবং সেই মতের সমর্থনে আন্দোলন করার সুবিধা কেবল গণতন্ত্রেই আছে, কোনও জেহাদি বা ধর্মীয় প্রজাতন্ত্রে নাই, থাকিতে পারে না। এই নির্বাচন গণতন্ত্রের জয়। বিক্ষুব্ধ-বিধ্বস্ত কাশ্মীরি সাধারণ্য তাই আজ বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশীদার।

শাসনের অন্তর্ধান

পশ্চিমবঙ্গে একটি সরকার আছে। যাঁহারা সেই সরকার চালাইতেছেন তাঁহাদের আর যাহাই বলা চলুক, অনভিজ্ঞ বলা চলিবে না। তাঁহারা তিন দশকের বেশি সময় রাজ্য প্রশাসনের চালক। অভিজ্ঞতা দক্ষতা বাড়াইয়া তোলে, বিশেষত সমস্যা সমাধানের দক্ষতা। সমস্যা সমাধান সরকারের একটি বড় কাজ। বড় সমস্যা, মাঝারি সমস্যা, ছোট সমস্যা, বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মোকাবিলা কী ভাবে করা হইতেছে, তাহাই একটি প্রশাসনের উৎকর্ষের সূচক। প্রশাসনের উৎকর্ষ দুইটি বস্তু দিয়া নির্ধারিত হয়। এক, প্রশাসন যাঁহারা হাতেকলমে পরিচালনা করিতেছেন সেই আমলা ও কর্মীদের দক্ষতা। দুই, প্রশাসনের লাগাম যাঁহাদের হাতে ধরা আছে সেই রাজনীতিকদের নেতৃত্ব। দুই তরফের সম্মিলিত দক্ষতা এবং বোঝাপড়াই সরকারি যন্ত্রের গুণমান নির্ধারণ করিয়া দেয়। তিন দশক ধরিয়া একটি রাজ্যের প্রশাসন চালনার পরে বামফ্রন্টের রাজনীতিক ও সরকারি কর্তাদের এই দক্ষতায় কোনও ঘাটতি থাকার কথা ছিল না। বিশেষত প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তাঁহারা একটি সুবিন্যস্ত পরিচালন কাঠামো তৈয়ারি করিয়াছেন ও তাহাকে সযত্নে লালন করিয়া চলিতেছেন। সেই কাঠামোটি দলতন্ত্রের সূত্রে আবদ্ধ। তাহার রাজনৈতিক তাৎপর্য যাহাই হউক, প্রশাসনিকতার ক্ষেত্রে এই বাস্তবটি বিশেষ কার্যকর হইয়া উঠিবে, রাজ্যের শাসকরা নিশ্চয়ই এমন একটি আশা করিয়াছিলেন। দল এবং প্রশাসনকে এক সূত্রে মিলাইয়া দেওয়ার নীতিটি এক ধরনের প্রশাসনিকতার নীতি।

পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা বলিয়া দেয়, সেই নীতি বাস্তবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, বরং সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। যত দিন যাইতেছে, প্রশাসনিক তৎপরতার হাল কেবল লজ্জাকর নয়, ভীতিপ্রদ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সাম্প্রতিক কয়েক দিনের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই চলিবে। এক, লালগড়ে মাওবাদী ধরিতে গিয়া পুলিশ স্কুলের কিছু নাবালক ছাত্র তুলিয়া আনিয়াছে, অতঃপর গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়িয়া সম্পূর্ণ বেকুব বনিয়া বসিয়া আছে। দুই, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের অনুমোদনের প্রশ্নে দীর্ঘ দিন কার্যত নিশ্চল থাকিবার পরে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বেসামাল হইবার পরে রাজ্য সরকার শেষরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। তিন, মশকবাহিত অসুখের মোকাবিলায় পুরসভা ও প্রশাসন আগাগোড়া দিশাহারা, নিজেদের অপদার্থতা ঢাকিতে কর্তাব্যক্তিরা রকমারি অজুহাত এবং অসত্যভাষণের আশ্রয় লইতেছেন, ‘অজানা জ্বর’-এ মৃত্যুর মিছিল চলিতেছে। চার, মহানগরের রাজপথে রাত্রিবেলায় চালকরা বেসামাল হইয়া গাড়ি চালাইতেছেন, পুলিশ দর্শক, অথবা দর্শকও নয়। পাঁচ, উত্তর কলিকাতায় একটি উড়ালপুলের শিলান্যাস হইয়াছে এক বছর আগে, কিন্তু কাজের বরাত কে পাবে, তাহা লইয়া রাজ্য সরকারের দুই দফতরের টানাপড়েন চলিতেছে, কাজ এখনও শুরু হয় নাই। তালিকা দীর্ঘতর করিয়া লাভ নাই। প্রতি দিনের সংবাদপত্রে এমন অগণিত দৃষ্টান্ত মিলিবে। মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আরও বিস্তর। সহজ সত্যটি ইহাই যে, পশ্চিমবঙ্গে বহু কাজই ঠিক ভাবে হয় না। সমন্বয়ের অভাব, শাসনের অভাব, শৃঙ্খলার অভাব, সব মিলাইয়া আক্ষরিক অর্থে অ-রাজকতা। এক অর্থে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট লালগড় তৈয়ারি হইয়া চলিয়াছে, যেখানে কোনও নিয়ম নাই, কোনও শাসন নাই। যাঁহারা রাজ্য চালাইতেছেন, তাঁহাদের শাসনের নৈতিক অধিকার চলিয়া গেলে এমন হইয়া থাকে। সুশাসন বহুলাংশে নির্ভর করে শাসকের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর। পশ্চিমবঙ্গে সেই বিশ্বাসযোগ্যতায় আঘাত লাগিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী তাহা খেয়াল রাখিয়াছেন কি?

সম্পাদক সমীপেষু

নামুন, কিন্তু বেসামাল হবেন না

১৪ অক্টোবর পুরী’তে বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ সমুদ্রস্নান করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলাম। পূর্ণিমার টান থাকায় সমুদ্র সে দিন বেশ অশান্ত ছিল। অনেকেই নুলিয়া ছাড়া সমুদ্রে নামতে সাহস করছিলেন না। কিন্তু সমুদ্রস্নানের ব্যাপারে আমি চিরকালই একটু বেপরোয়া আর আনাড়ি স্বভাবের। পরিবারের বাকি সদস্যদের সাবধানবাণী কানে না তুলে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলাম। মোটামুটি ভাবে মিনিট কয়েক কোমরজলে স্নান করেছিলাম। সাহস করে আর দু’এক পা এগোতেই বুঝতে পারলাম সমুদ্রের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বেশ একটা খাদের মতো গর্ত তৈরি হয়েছে। মুহূর্তের অসতর্কতায় পা-দুটো ওই অচেনা খাদে গিয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম, এক সর্বনাশী মৃত্যুগহ্বরে পড়েছি। পায়ের নীচে কোনও জমি পাচ্ছি না, সাঁতার জানি না বলে লোনা জল হু-হু করে মুখ-নাক দিয়ে ঢুকছে আর আমি ক্রমশই তলিয়ে যাচ্ছি। সমুদ্রের আন্ডারকারেন্টে সকলকেই সে দিন পাড়ের উল্টো দিকে টানছিল। দু’এক মিনিট উত্তাল জলরাশির মধ্যে ধস্তাধস্তি করতে করতে বুঝলাম, প্রাণরক্ষার আর কোনও আশা নেই। মনে হল, কত মামুলি ভাবে জীবনটা শেষ হয়ে গেল! এর পরেই হয়তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। যাঁরা আশেপাশে আমায় ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁদের চিৎকারে সমুদ্রপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা দু’এক জন নুলিয়া আমায় কোনও ভাবে চুলের মুঠি ধরে তুলে আনে। সেই মুহূর্তে আমার অচেতন দেহটি নাকি আরও

পুরীর সমুদ্র। *ছবি: দেবীপ্রসাদ সিংহ*

গভীর সমুদ্রে ঢুকে যাচ্ছিল। তার পর প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে অক্সিজেন-স্যালাইন, হাসপাতাল-নার্সিংহোম ইত্যাদি শ্বাসরুদ্ধকারী পর্বের শেষে আমি সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরি। মৃত্যুকে এত কাছ থেকে দেখার পর কয়েকদিন যেন ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

মূর্খ বীরত্ব অথবা ভাগ্যানুকূল্যে বেঁচে যাওয়ার কাহিনি প্রচারের উদ্দেশ্যে এই চিঠি নয়। আমার মতো অসংখ্য ভ্রমণপিপাসু ও বিশেষত সমুদ্রপ্রেমী মানুষ পুরী কিংবা দিঘার সমুদ্রকে নিরাপদ ভেবে স্নানের উদ্দাম নেশায় নেমে পড়েন, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক সমুদ্রস্নান (বিশেষত নুলিয়া ছাড়া) আজ আর তেমন নিরাপদ বোধ হচ্ছে না। পুরীর সমুদ্র, যাকে এত কাল আমরা এতখানি নিরাপদ ভেবেছি, সেখানেই এ ভাবে মরণফাঁদ তৈরি হয়েছে। ঢেউয়ের আচরণও বেশ অপ্রত্যাশিত ও অনিয়মিত। তাই সকলের উদ্দেশেই বলা, আগামী দিনে সমুদ্রস্নানের ব্যাপারে আমাদের বাড়তি সতর্ক হওয়া উচিত। আমার সেই দিনের অভিজ্ঞতার কাছাকাছি অভিজ্ঞতা সম্প্রতি অনেকেরই হয়েছে। এ ঘটনার আগের দিনেই এক দম্পতি সমুদ্রস্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যান।

শ্রীজগন্নাথদেব অথবা ভাগ্যের সাহচর্য না থাকলে, তার চেয়েও বড় কথা, স্থানীয় মানুষের সহৃদয় সহযোগিতা ও তৎপরতা না থাকলে সে দিন মৃত্যুমুখ থেকে হয়তো ফেরাই হত না। ওই দুর্ঘটনার পর আমার পরিবারের সদস্যরা অসংখ্য স্থানীয় মানুষের যে অকৃপণ সহযোগিতা পেয়েছিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

শান্তনু মুখোপাধ্যায়। কলকাতা-৯১

সেটা ছিল বিদ্রোহ, এটা গৃহযুদ্ধ

বিনপুর, শালবনি, ঝাড়গ্রাম সেই সংকেত দিচ্ছে। আমরা কি সেই সংকেত শুনব? লিখছেন **রণবীর সমাদ্দার**

পশ্চিমবঙ্গে স্বঘোষিত গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। অনেকে মনে করছেন, চল্লিশ বছর পরে আবার ষাটের দশক ফিরে এল। উনিশশো আটষট্টির প্রত্যাবর্তন। কিন্তু, তা নয়। সেটা ছিল বিদ্রোহ, এটা যুদ্ধ। এই দুইয়ের তফাত নিয়ে এখানে লেখার অবকাশ নেই। দর্শন আলোচনার অবকাশও নেই। কিন্তু, সজাগ হওয়া দরকার, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, যার মূল্য দিতে হবে অনেক। মানবিক বিপর্যয় এবং মানবাধিকার ক্ষয়, দুইয়েরই মানদণ্ডে।

বিনপুর, শালবনি, ঝাড়গ্রাম থেকে জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আদিবাসী অভ্যুত্থান এই অঘোষিত গৃহযুদ্ধের একটা দিক। শাসকের শাসনযোগ্যতা নিয়ে আজ প্রশ্ন এবং সংশয় সর্বাত্মক হয়ে উঠেছে। তার কথার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে একই সন্দেহ সমাজের নানা স্তরে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও দুটো দিক। সবার অলক্ষ্যে কখন যে এই দুটো দিক মাথা চাড়া দিয়ে নজর কাড়ার অবস্থায় এল, এখন আর ভাবার সময় নেই।

প্রথম বিষয়টা হল: দেশভাগের পরেও নতুন করে পশ্চিমবঙ্গ এক সমন্বিত রূপ গ্রহণে সমর্থ হয়েছিল। উত্তর বাংলা, রাঢ়বাংলা, গাঙ্গেয় বাংলা, এবং জঙ্গলমহল, এই সব নানা অংশে এক সমন্বিত আন্দোলনের ফলে, যার চরিত্র ছিল বামপন্থী এবং আদর্শবাদী, পশ্চিমবঙ্গ একই প্রশাসনের অধীন, একটি প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার অংশীদার রূপে বেড়ে উঠল। আজ কলকাতা-কেন্দ্রিক প্রশাসন, দুর্নীতি, কৃষিকে অবহেলা, একচেটিয়া পুঁজির পিছনে ছোটা, প্রত্যন্ত অঞ্চলকে অবহেলা ও আরও নানা কারণে আজ পশ্চিমবঙ্গের এই সমন্বিত রূপ চূর্ণ। জঙ্গলমহল আজ যে রুদ্ররূপ ধারণ করেছে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বেশ কিছু বছরের তাচ্ছিল্য, অবহেলা, উচ্চবর্ণের বাঙালিয়ানা জঙ্গলমহলের উপর চাপিয়ে দেওয়া এবং সম্পন্ন ও উচ্চবিত্ত গ্রামীণ কুলের উপর নির্ভরতা আজ সর্বত্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় বিষয় আরও মারাত্মক: পুলিশ এবং প্রশাসকবৃন্দ, যাদের নাম কাগজে আসে এই সব অসন্তোষ, অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে, তাদের এক বড় অংশের বাঙালি সমাজের সঙ্গে যোগ নেই। এই বড়কর্তারা সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কাঠামোর ফল হিসেব পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাট সামলানোর কাজ করছেন। এঁদের মূল মন্ত্র হল: প্রতিটি প্রতিবাদকে শাসকদের কানে নিরাপত্তার বিষয় রূপে হাজির করা। এটা প্রমাণ করা যে, প্রতিটি সক্রিয়তা প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজ। এবং এর নিরাময় একটাই। পুলিশ পাঠানো, দলীয় কর্মীদের উর্দিবিহীন লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করা, মানুষকে ধমকানো, পেটানো, ভয় দেখানো, সহবত শেখানো, যাতে জনসাধারণ বেয়াদব হয়ে মর্যাদা এবং ন্যায় দাবি না করে বসে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যা নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় তখনই, যখন প্রশাসক ও জনসাধারণের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, যখন শাসকের মূল নীতি হয়ে দাঁড়ায় ভয় দেখানো। এতে লাভ হয় না বেশি দিন। শুধু প্রলয়ের সম্ভাবনা থেকে চোখ সরিয়ে রাখায় সাহায্য করে এই দৃষ্টিভঙ্গি। এতে মাদকতা আছে; সামাজিক বোধ, ন্যায়বোধ এবং বিচারবোধ নেই।

ঘটনা যে ভাবে এগোচ্ছে, আজ হোক, কাল হোক, প্রশাসকবর্গের সঙ্গে উদ্যত জনসাধারণের নানা স্থানে সংঘর্ষ অনিবার্য। নানা জনমণ্ডলীর ওপর নানা ভাবে এ বারে দমন-ব্যবস্থা নামবে শেষ ব্যবস্থা রূপে। তার পরিণামের সামান্য ইঙ্গিত আমরা নন্দীগ্রামে পেয়েছি। যে গৃহযুদ্ধের প্রথম পর্ব আমরা দেখব বা দেখছি, তাতে শঙ্কার আরও কারণ, যুযুধান দুই পক্ষের পরিষ্কার ভেদরেখা নেই; নানা দল, গোষ্ঠী, অঞ্চল, বর্গ নিজের নিজের প্রতি বঞ্চনার বিরুদ্ধে সামাজিক ন্যায়ের দাবিতে যে খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হবে বা হচ্ছে, তাতে এ-ও আশঙ্কা যে, প্রশাসনের বড়কর্তারা এবং পুলিশ বা আধা সামরিক বাহিনীর বহিরাগত উচ্চপদস্থরা মন্ত্রী বিধায়ক রাজনীতিকদের বোঝাতে সক্ষম হবেন (বা হয়েছেন) যে, এ ভাবে চললে শাসন শেষ। কাজেই, ডাণ্ডা, বন্দুক, সাঁজোয়া গাড়ি নামানো দরকার।

লালগড়ের পরিস্থিতি থেকে কবে

প্রতিবাদ। লালগড়, নভেম্বর ২০০৮

প্রশাসককুল অন্য শিক্ষা নেবেন? তার সম্ভাবনাও খুব কম। রাজনৈতিক নেতারাই বা কী শিক্ষা নেবেন? সি পি আই (এম)-এর দিল্লিস্থ নেতারা কলকাতায় এসে এই এক-দু’দিন আগেও যে সব মন্তব্য করছেন, তাতে ভরসা জাগে না। আর, প্রখ্যাত উচ্চ বর্ণ বুদ্ধিজীবিকুল, যাঁরা পৃথিবীখ্যাত বলে আমরা গর্ব করি, তাঁরা যে এগিয়ে এসে বলবেন এই উদ্যত বিপর্যয় থেকে স্বভূমি বা স্বদেশকে বাঁচানো দরকার, তারও লক্ষণ নেই। আন্তর্জাতিক খ্যাতির টানে দেশ নিয়ে ভাবনাচিন্তার রসদ অনেকটাই শুকিয়ে গেছে।

শুধু রাজনীতিতে আলোচনা ফিরে আসুক, এটা বলা যথেষ্ট নয়। ডি এম-এর ঘরে প্রতিবাদীকে ডেকে দু’চার কথা বলা আগেও হত, এখনও হয়, তাতে সংঘর্ষ থামে না। যুদ্ধে যেমন যুদ্ধবিরতি লাগে, এই সামাজিক যুদ্ধেও যুদ্ধবিরতি লাগবে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অগ্রগণ্যদের এই উদ্যোগ নিতেই হবে, যদি সত্যিই সর্বব্যাপী সংঘর্ষের ভবিতব্য থেকে নিস্তার চাই। তাতে শাসককে মাথা ঝোঁকাতে হবে, কথা শুনতে হবে, শাসন নীতির মূলে স্থাপন করতে হবে আলাপচারিতাকে। জনগণকে বলতে হবে: ভুল হয়েছে। ত্রুটি স্বীকারে বাধা নেই।

যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সর্বব্যাপী সংঘর্ষের সূচনা ২০০৮-এই হল। কিন্তু, এ কথাও সমান ঠিক যে, যুদ্ধ সম্পর্কে চৈতন্য, মানবাধিকার-ক্ষয় ও মানবিক বিপর্যয়ের পরিণতি সম্পর্কে চৈতন্য সমাজকে এ সম্পর্কে সরব করে তুলবে যে, দমন নয়, আলাপ-আলোচনা চাই। আজ যা ঘটছে, না নিরাপত্তার বিষয় নয়, তা সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন।

লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ-এর অধিকর্তা

রাতের রাজনীতি না ছাড়লে মাওবাদীরা দিনের রাজনীতিতে আসবেন কী করে

সোমেশ ভট্টাচার্য

নন্দীগ্রামের পরে লালগড়। বাহ্যলক্ষণ অনেকটাই এক। কার্যকারণে ফারাক আছে বটে। তবে মিল অন্তত তিন জায়গায়: পুলিশি ক্ষমতার অপব্যবহার, সি পি এম তথা প্রশাসনের অপরিণামদর্শিতা ও সর্বোপরি, মাওবাদীদের উপস্থিতি। নন্দীগ্রামে এই উপস্থিতি ‘প্রমাণ’ করা যায়নি, লালগড়ে তাঁরা নিজেরাই বিবৃতি দিয়ে জানান দিয়েছেন।

শালবনিতে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে হামলার অভিযোগে তিন স্কুলছাত্রের গ্রেফতার আদিবাসীরা মানতে পারেননি। মাওবাদী খোঁজার নামে পুলিশের ‘তল্লাশি’ বহু দিনই তাঁদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এ বার তাঁরা ফেটে পড়েছেন। সমর্থন জোগাচ্ছে ঝাড়খণ্ডী দলগুলি। গণভিত্তি বাড়ানোর এমন সুযোগই মাওবাদীরা খোঁজেন, সম্ভবত নন্দীগ্রামেও খুঁজেছিলেন। বেশ কিছু কাল তাঁরা এই উদ্দেশ্যে ঝাড়খণ্ডী আবেগকে লালন করে আসছেন। ঝাড়খণ্ডী শক্তিগুলিও নিতান্ত কেজো উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচ্ছে তাঁদের। ‘বিপ্লব’ ক্রমশ আটকে পড়ছে স্থানিক রাজনীতির সংকীর্ণ ও হিংস্র আবর্তে।

আর ঠিক এই কারণেই শালবনি, লালগড়, ঝাড়গ্রামের ঘটনাকে রাজ্যে মাওবাদীদের শক্তিবৃদ্ধির সূচক হিসেবে ধরে নেওয়া যাচ্ছে না। সি পি এমের এলাকা শালবনিতে ধানখেত দিয়ে এক কিলোমিটারেরও বেশি তার পেতে তাঁরা পুলিশ, বিশেষত সি পি এমকে চমকে দিয়েছেন। কিছু সি পি এম কর্মী-সমর্থক তাঁদের সঙ্গে গোপনে হাত না-মেলালে এটা সম্ভব নয়। সাফল্য বটে, কিন্তু কতটুকু? গত ২২ অক্টোবর বেলপাহাড়িতে ল্যান্ডমাইনে মেডিক্যাল ভ্যান উড়ে যাওয়ার পরেও কার্যত এই প্রশ্নটাই সামনে এসেছিল। মাওবাদীরা বিবৃতি দিয়ে জানান, ‘ভুল’ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ মারাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য (এতে তাঁরা দোষ দেখেন না)।

কিন্তু, কেন এই ভুল? চার বছর ধরে কাজ করে চলা স্বাস্থ্য দফতরের গাড়িকে পুলিশের গাড়ি বলে ভুল হয় কী করে? বিভিন্ন মাধ্যমের খবর সত্য হলে, বিস্ফোরণের জন্য ঝাড়খণ্ড থেকে লোক আনা হয়েছিল। বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে বেলপাহাড়িতে ডাকা বন্‌ধও ‘সফল’, যা এক সময় ভাবা যেত না। শালবনির ক্ষেত্রেও নাকি অন্ধ্রের নেতা চন্দ্রশেখর নামে ছিলেন দায়িত্বে। বাংলার এক ভূমিপুত্রকে সরিয়েই তাঁকে স্কোয়াডের নেতৃত্বে আনা হয়েছে!

লক্ষণীয়, মাওবাদীরা গত দেড় বছরে এ রাজ্যে যত হামলা

চালিয়েছেন, দু’একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তার প্রায় সবই ঝাড়খণ্ড লাগোয়া এলাকায়। পশ্চিম মেদিনীপুরে বেলপাহাড়ি ও লালগড় (পাশেই শালবনি), পুরুলিয়ায় বলরামপুর-বরাবাজার। সম্প্রতি যোগ হয়েছে বীরভূমের তাঁতিপাড়া। অর্থাৎ নাশকতা ঘটিয়ে ঝাড়খণ্ডে পালানোর পুরনো ছক ভেঙে মাওবাদীরা এখনও বেরোতে পারেননি। রাজ্যের সর্বত্র যে সরকার-বিরোধিতার চোরা হাওয়া, সেখানেও কিছু বিচ্ছিন্ন পকেট ছাড়া তাঁদের কার্যকর কোনও সংগঠন নেই।

অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে যে মাওবাদীদের সবচেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হবে, তা প্রত্যাশিতই ছিল। কারণ, অন্য কোথাও আর একটা মার্কসবাদী দলের সঙ্গে টক্কর নিতে হয়নি মাওবাদীদের। সি পি এম রাজ্যে তাঁদের নিষিদ্ধ করেনি। বরং ‘রাজনৈতিক’ মোকাবিলার কথা ঘোষণা করেছিল। ক্যাডার দিয়ে যথাসম্ভব ‘প্রতিরোধ’ করার পাশাপাশি কৌশল হিসেবে উন্নয়নকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিল সি পি এম। তার জন্য পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে কেশপুরে এমসিসি-জনযুদ্ধ সামলানো

বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে বেলপাহাড়িতে বন্‌ধও ‘সফল’ হয়েছে, যা এক সময় ভাবা যেত না। শালবনির ক্ষেত্রেও অন্ধ্রের এক নেতা নাকি ছিলেন দায়িত্বে। বাংলার এক ভূমিপুত্রকে সরিয়েই তাঁকে আনা হয়েছে!

সুশান্ত ঘোষকে তার মাথায় বসানো হয়। কাজ যে খুব কিছু হয়েছে তা নয়। কিন্তু যে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ‘উন্নয়ন’ বা নিছক কিছু সরকারি সাহায্যই হাতিয়ার হতে পারে, তার আদর্শগত ভিত্তি নিয়েই তো প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

সমস্যা হল, মার্ক্সবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে র‍্যাডিক্যাল পন্থায় মাওবাদীরা বিশ্বাস করেন, তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে গিয়েছে। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে কী ভাবে সেই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটানো যেতে পারে, তার বিকল্প মডেলও ওঁরা হাজির করতে পারেননি। সি পি এমের ভিতরে-বাইরেও এই মানিয়ে নেওয়ার পন্থা নিয়ে বিস্তর তর্ক। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে টিকে থাকার জন্য প্রায়োগিক মার্ক্সবাদের ধার না-ধারলেও চলে। র‍্যাডিক্যালদের সেই সুবিধা নেই। বৃহত্তর জনতার কাছে বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার রাস্তা তাঁরা নিজেরাই বন্ধ করে রেখেছেন। ‘চলমান জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব’ বদ্ধ বৃত্তে ঘুরপাক খেলে কিন্তু জঙ্গলের মানুষও দীর্ঘ দিন তাতে যুক্ত থাকতে পারেন না, বিশেষত যখন এর জন্য সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের বিরাগভাজন হতে হয়।

এই অবস্থায় সংগঠন টিকিয়ে রাখার জন্যই মতাদর্শে নির্ভরতা ছেড়ে এলাকাভিত্তিক গোষ্ঠীস্বার্থের হাত ধরতে হচ্ছে মাওবাদীদের। বিহারে-ঝাড়খণ্ডে অনেক দিন আগেই তাঁদের জাতপাতের রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরকে ঝাড়খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে বেশ কিছু দিন ধরেই আন্দোলনে নেমেছে ঝাড়খণ্ডী দলগুলি। মাওবাদীরাও তিন জেলাকে নিয়ে স্বশাসিত পরিষদ গঠনের দাবি তুলেছেন। আদিবাসীদের স্বাধিকারের দাবি অবশ্যই আলোচ্য। কিন্তু তাকে সামনে রেখে ভিন্ন রাজনীতির ছক কষা? যে সংসদীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে মাওবাদীদের ঘোষিত লড়াই, তাঁরা কার্যত সেই সাদা-কালো ছকেরই বোড়ে হয়ে যাচ্ছেন না তো?

মাওবাদীদের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক, জেলবন্দি সোমেন ওরফে হিমাদ্রি সেন রায় সম্প্রতি বলেছেন, সুযোগ পেলে তাঁদের একটা বড় অংশ প্রকাশ্য রাজনীতিতে আসতে চান। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায়, ‘মুক্তাঞ্চলে’ বদ্ধ হয়ে পড়ার সঙ্কটটা তাঁরাও বুঝছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে আসবেন কী ভাবে? রাতের রাজনীতি না-ছাড়লে কি দিনের রাজনীতিতে পা রাখা চলে?

এক ফোঁটা অ-শ্বেত রক্ত থাকলেই যেখানে কালো বলা হয়

সাদা এবং কালো, চিরকাল আমেরিকায় যে দুই পৃথিবী আলাদা হয়ে থেকেছে, কখনও শান্তিপূর্ণ, কখনও অশান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে, ওবামা যেন তাদের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রতীক, লিখছেন **মৈত্রীশ ঘটক**। *আজ দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব*

এ বার আসি, কোন কোন বিষয় ভোটারদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেই প্রসঙ্গে। নীচের সারণিতে এই নির্বাচনের এবং গত নির্বাচনের তিনটি মূল বিষয় নিয়ে ভোটারদের মতামত এবং তা তাঁদের ভোটকে কতটা প্রভাবিত করেছে, দেখা যাবে। বিষয়গুলি হল: অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, ইরাক যুদ্ধ এবং বুশ প্রশাসনের মূল্যায়ন। গত বারের তুলনায় স্বাভাবিক ভাবেই ভোটারদের বিশাল বড় একটা অংশর মতে, অর্থনীতির হাল ভাল নয়। ইরাক যুদ্ধ নিয়ে অসন্তোষ গত বারের থেকে বেশি— প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটার এই যুদ্ধ সমর্থন করে না। বুশ প্রশাসন সম্পর্কে গত বারের থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় ভোটারেরা অসন্তুষ্ট। এগুলো ওবামাকে সাহায্য করেছে নিশ্চয়ই। তা হলেও গত বার যাঁরা এই বিষয়গুলি নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁরা কেরিকে যে অনুপাতে ভোট দেন, সেই অনুপাতে এঁদের কাছ থেকে ওবামা এ বার ভোট পাননি। এর ব্যাখ্যার একটা অংশ হল, এ বারে বাকি সবার মতো অধিকাংশ রিপাবলিকানও একমত যে, অর্থনীতির হাল এ বার অনেক খারাপ। তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের দলের লোককেই ভোট দিয়েছেন। তাই, এই গোষ্ঠী থেকে ওবামার ভোটের হার কেরির তুলনায় কমেছে। একই কথা বাকি বিষয়গুলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আর, তা ছাড়া অল্প সংখ্যক কিছু শ্বেতাঙ্গ ডেমোক্র্যাট ভোটার, যাঁরা বুশের ভক্ত নন বা ইরাক যুদ্ধ সমর্থন করেন না, ওবামাকে শেষ পর্যন্ত ভোট দেননি। হয়তো ওবামার বদলে হিলারি ক্লিন্টন দাঁড়ালে তাঁরা তাঁকে ভোট দিতেন।

অর্থনীতি-রাজনীতির প্রভাব নিশ্চয়ই পড়েছে এই নির্বাচনে। কিন্তু, ব্যক্তি ওবামাকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষেরা কী চোখে দেখেছেন, তার উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আমেরিকার বর্ণবৈষম্যের ইতিহাসে কারও রক্তে এক ফোঁটা অ-শ্বেতাঙ্গ রক্ত থাকলেও তাঁকে কৃষ্ণাঙ্গ বলে ধরা হত। তাই মিশ্র-বর্ণের হলেও এক ভাবে দেখলে ওবামা কৃষ্ণাঙ্গ। কিন্তু, তিনি বড় হয়ে ওঠেন মূলত তাঁর শ্বেতাঙ্গ দাদু-দিদিমার কাছে। আর্থিক ভাবে সচ্ছল না হলেও, তাঁর বড় হয়ে ওঠার গল্পের সঙ্গে আমেরিকার এক জন গড়পড়তা কৃষ্ণাঙ্গ ছেলের তুলনায় এক জন গড়পড়তা শ্বেতাঙ্গ ছেলের বড় হয়ে ওঠার গল্পের মিল অনেক বেশি।

পরিবেশ, পরিবার এবং প্রতিভার জোরে তিনি যা-ই করেছেন, তাতেই পেয়েছেন অসাধারণ সাফল্য। শুধু তা-ই নয়, সহপাঠী, অধ্যাপক, সহকর্মী, সবার চোখে পড়েছে তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং দল-মত-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশার অসাধারণ ক্ষমতা। যেমন সহজ তিনি হার্ভার্ডের শ্বেতাঙ্গ-প্রধান পরিবেশে, তেমনই সহজ তিনি শিকাগোর অপরাধ এবং দারিদ্র-অধ্যুষিত কৃষ্ণাঙ্গ-প্রধান এলাকায় সমাজসেবা মূলক কাজে। চিরকাল ধরে যে দুই পৃথিবী মূলত আলাদা থেকেছে, কখনও শান্তিপূর্ণ, কখনও অশান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে, তাঁর অনায়াস যাতায়াত তাদের মধ্যে। তিনি যেন সেই দুই আলাদা পৃথিবীর মধ্যে সেতুবন্ধনের সম্ভাবনার প্রতীক।

অথচ, বড় হয়ে ওঠার সময়ে তিনি বার বার অনুভব করেছেন সবার থেকে আলাদা হওয়ার যন্ত্রণা। যেমন তাঁর পারিবারিক পরিবেশের জন্যে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের কাছে তিনি বহিরাগত, তেমনই শ্বেতাঙ্গদের কাছেও তিনি তাঁর বর্ণের জন্যে এক জন আগন্তুক। ওবামার অসাধারণত্ব হল এই যে, এই দ্বন্দ্বকে তিনি পরিণত করেছেন আত্মশক্তিতে। তিনি কৃষ্ণাঙ্গ, কিন্তু শুধু কৃষ্ণাঙ্গ নন। তিনি এক জন আমেরিকান, যিনি নিজের প্রতিভা এবং পরিশ্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর গল্পের সঙ্গে বর্ণনির্বিশেষে আর পাঁচ জন অভিবাসীর গল্পের মূল কোনও ফারাক নেই। আমেরিকার সাম্প্রতিক ইতিহাসে আর এক জন জনপ্রিয় রাজনৈতিক বিল ক্লিন্টনও সচ্ছল পরিবারে জন্মাননি। প্রতিভা এবং পরিশ্রমের জোরে সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু, শ্বেতাঙ্গ হওয়ায় তাঁর গল্পটি মনোগ্রাহী হলেও, অসাধারণ মনে হয় না। আরও বড় কথা, তাঁর বড় হয়ে ওঠার গল্প না জানলে তাঁকে দেখে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু, ওবামার বর্ণ তাঁকে বাকিদের থেকে আলাদা করে আরও এক ভাবে। দৃশ্যতই তিনি সবার কাছে আমেরিকান ড্রিম-এর এক উজ্জ্বল প্রতীক। আর, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের কাছে এর সঙ্গে মিশে আছে গর্ব, আমরাও পারি, যা ওবামার নির্বাচনের স্লোগান: ‘ইয়েস, উই ক্যান’।

ওবামার গল্পের তাৎপর্য তো শুধু যুক্তি, তর্ক, সমাজতত্ত্ব দিয়ে ধরা যাবে না। আবেগের ঘনঘটা ছাড়া রূপকথা (হোক না গণতান্ত্রিক) সম্পূর্ণ হয়? ছোট একটা ঘটনা বলে শেষ করি।

হাত বাড়ালেই। ওবামা। ছবি: এ এফ পি

জেসি জ্যাকসন, ষাটের দশকের সিভিল রাইটস আন্দোলনের এক তরুণ তুর্কি। আগেই বলেছি, ওবামা-র আগে তিনি হলেন একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ নেতা যিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দৌড়ে কিঞ্চিৎ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সারা জীবন তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে। ওবামার জয়ের রাতে উল্লাসে মেতেছে যখন সারা দেশ, সর্ব বর্ণের, সর্ব শ্রেণির মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উৎসবে, এক কোণে দাঁড়িয়ে শিশুর মতো হাউ হাউ করে কেঁদে যাচ্ছেন জেসি, রাগী, প্রতিবাদী, পোড়-খাওয়া রাজনীতিক জেসি। কী ছিল সেই কান্নায়? অসম্ভব সম্ভব হওয়ার আনন্দ? নিজের প্রজন্মের ব্যর্থতার জ্বালা, সন্তানসম নতুন প্রজন্মের অভাবিত সাফল্যের আনন্দ? নাকি, তাঁর মনে পড়ছিল ষাটের দশকের আন্দোলনের নেতা ও অগণিত সঙ্গীদের কথা, যাঁরা দেখে যেতে পারলেন না তাঁদের রক্তমাখা পথ কী দীর্ঘ পরিক্রমা করে আজ এখানে এসে পৌঁছল আমেরিকা? জানি না। জানি এই যে, ওবামা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলে তাঁর সরকারের সব কাজ সমর্থন করতে পারব না। সন্দেহ জাগে, পারবেন কি তিনি আমেরিকার আগ্রাসী বিদেশনীতির মৌলিক পরিবর্তন আনতে? আশঙ্কা হয়, তাঁর রূপকথা রয়ে যাবে না তো রাতের তারা হয়ে বাস্তবের রৌদ্রতপ্ত আকাশে? আশঙ্কা অমূলক নয়, কারণ প্রত্যাশা অপরিসীম। তিনি যেন আমাদের সময়ের স্বপ্নপূরণের প্রতীক, ইচ্ছাপূরণের ক্যানভাস।

তা সত্ত্বেও আমি আশাবাদী। কোনও রক্তপাত না করে নিঃশব্দে গণতন্ত্র দুঃস্বপ্নসম এক অধ্যায়ের সমাপ্তি রচনা করল। চার দশক আগে যে শ্রেণির মানুষদের ভোট দেওয়ার অধিকার সুরক্ষিত ছিল না, তাঁদের এক জন আজ জনতার রায়ে পৃথিবীর সব চেয়ে ক্ষমতাশালী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান।

মন্দ কী? বারাক ওবামা। বারাক গণতন্ত্র।

(শেষ)

লেখক লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অর্থনীতির শিক্ষক

প্রার্থীরা কোন কারণে কত ভোট পেয়েছেন

প্রধান তিনটি বিতর্কিত বিষয়	২০০৪ মোট ভোটের	২০০৮ মোট ভোটের	সমর্থন কেরি	সমর্থন ওবামা
অর্থনীতির অবস্থা ভাল না	৫২%	৯৩%	৭৯%	৫৪%
ইরাক যুদ্ধ সমর্থন করেন না	৪৫%	৬৩%	৮৭%	৭৬%
বুশ সরকার নিয়ে অসন্তুষ্ট	৪৬%	৭১%	৯৩%	৬৭%